ক্রসফায়ারে আক্কেল আলী

হাসনাত আবদুল হাই

শহর বলতে এখন ঢাকা শহরই বোঝায়, কেননা সেখানেই সবাই থাকে যারা কেউ-কেটা আর যেখানে রয়েছে ঝলমলে দোকানপাট, অফিস-আদালত, গাড়ি-ঘোড়া। আর চাকরি। হরেক কিসিমের চাকরি, পিয়ন থেকে সাহেব, সব।

প্রথমে শোনার পর আক্কেল আলী লাজুক মুখে ইতস্ত্মত করে বলেছে, না, না। সাহেব হবার প্রয়োজন নেই। একটা ছোডোমোডো চাকরি হইলেই সারে। বুঝলেন না, লেখাপড়া তো তেমন করি নাই। বাপে জমি বিক্রি কইরে এসএসসি পর্যন্ত্ম ঠেইলে নিতে পারিছে। অহন তো সে নাই, জমি-জমাও উধাও। সব নাহি বন্ধক আছিলো জোতদারের কাছে। নিজেই দেহালো রেজিস্টার বই খুলে। টাকার হিসাব, বাপের বুড়ো আঙুলের টিপসই। আহারে সেই টিপসই দেইখে বুকের ভ্যাতরে কেমুন জানি উথাল-পাতাল ঝড় বয়ে গ্যালো। হাত দিয়ে আদর করিছে, মারধর করিছে বাপজান, ঐ বুড়ো আঙুলও ছ্যালো তার হাতের মধ্যি। ঐ আঙুলটারও ছাপ পড়েছে গায়ে। কালি বা ভুষো মাখা লয় তো। তাই দাগ পড়েনি শরীরে। কিন্তু মনডা হু হু করে উঠল জোতদারের রেজিস্টারে কালো ভুষো মাখা বাপের বুড়ো আঙুলের ছাপ দেইখে। কাঁদবার জোগার। মাথা নিচু করে ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলতেছি তহন জোতদার কাঁধে হাত রেখে কয়, মন খারাপ করো ক্যান? জমি গেছে যাক। তোমার বাপ-দাদা চাষা-ভুষো ছিল বলে কি তুমিও সেই পেশায় থাকবা? তা হবে কেন? তাহলে এই যে জমি বেচে বেচে তোমারে এতো পড়াশোনা করালো, স্কুল পরীক্ষা পাস করালো তোমার বাপে, তার কী লাভ হল? উহুহু। বাপের উদ্দেশ্য ছিলো তুমি জমি-জমা নিয়ে থাকবা না, হাত ময়লা করবা না। অফিসে চেয়ারে-টেবিলে বসে চাকরি করবা, সাহেব হবা। বাপের কথা মনে করে বুকটারে শক্ত করে বাঁধো। যাও শহরে যাও। সব চাকরি সেখানেই অপেক্ষা করতিছে।

সেই থেকে আক্কেল আলীর শহরে যাওয়া শুরু। সে প্রথমে আসে উপজেলায়। সেখানে সরকারি অফিসই সব। তবে কোথাও চাকরি খালি নেই। দালালদের পেছনে ঘুরে পিয়নের চাকরির জন্য কিছু টাকা খরচ করাই সার হল। তখন জোতদার বললেন, আরে মিয়া উপজেলা আবার শহর নাহি? গ্রাম ছিল, সাইনবোর্ড টাঙায়ে ঘোষণা দিল শহর। এরশাদের কা । সে নাকি বাদশাহী কায়দায় ফরমান জারি করিছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যেমুন দেশ, তেমুন রাজা-বাদশা। তারপর খিস্তি-খেউর থামিয়ে সে বলেছে, যাও জেলা শহরে যাও। সেখানে অনেক অফিস-আদালত, দোকান-পাট ভর্তি। গাড়ি-বাস-ট্রাকের ভিড়ে রাস্ত্মায় হাঁটা যায় না। এত লোক যেহানে সেহানে আর একটা লোককে বুক পেতে নিতে অসুবিধা কী। বলে জোতদার জেলা অফিসে যাওয়ার পথ বাতলে দিয়েছে আর দয়াপরবশ হয়ে হাতে গুঁজে দিয়েছে কিছু টাকা।

আক্কেল আলী একটা না, বেশ কয়েকটা জেলায় ঘুরেছে। অফিস দেখলেই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সামনে লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করেছে। শুনে কেউ হেসেছে, কেউ অবাক হয়ে তাকিয়েছে। কেউ যেতে যেতে বলেছে, পাগল নাকি।

শেষ পর্যন্ত্ম আক্কেল আলী ঢাকায় যাবার সিদ্ধান্ত্ম নিল। শুনে জোতদার খুব খুশি। হেসে বললেন, এই তো এত দিনে মাথায় বুদ্ধির জট খুলিছে তোমার। আগেই যাওন দরকার ছিল। ঢাকাই তো সব। কী আছে তার বাইরে? শুনতে পাই সেখানে লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়তিছে। তার মানে বুঝলা না? চাকরি। চাকরি। চাকরি ডেইকে নিতেছে। যাও দেরি কইরো না। আমারই বলা উচিত ছিল অনেক আগে। জোতদার কথা শেষ করে লুঙ্গির ভেতর হাত ঢুকিয়ে তার অ কোষ চুলকাতে থাকে।

বাসে উঠতে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় আক্কেল আলীর। ভীষণ ভিড়। লোকের ঠেলাঠেলি, হৈচৈ আর বাসের হর্নের শব্দে তার কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগার। কোনওরকমে ছাদের ওপর বসবার জাগা পায় আক্কেল আলী। সুস্থির হয়ে বসে সে দেখে যাত্রীদের প্রায় সবার হাতে লাঠি। তার মাথায় সবুজ-লাল পতাকা। পাশের লোকটা তাকে দেখে বলে, কই মিয়া তোমার হাতের ফ্ল্যাগ কই?

ফ্ল্যাগ? আক্কেল আলী বেশ ফাপরে পড়ে। কী বলবে ভেবে পায় না। ফ্ল্যাগই কি বাসে ওঠার টিকিট? সে সঙ্কুচিত হয়ে বলে, কত দাম ভাই? লোকটি তাকে দেখে নিয়ে বলে, কত টাকা মানে? পার্টি অফিস থেকে দেয়নি।

পার্টি? এ আবার কী? আক্কেল আলী মাথা চুলকায়। তারপর বলে, না দ্যায় নাই। তাড়াতাড়ি ছুইটে আইলাম কি-না। কথা শেষ করে সে সপ্রতিভ হবার জন্য মুখে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে তোলে। বাসটা তখন হেলে-দুলে উঠেছে। যেন বসে থাকা হাতি আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে। রাস্তায় দু'দিকে তখনও লোকের ভিড়। পান-সিগারেট বিক্রিতে ব্যস্ত ছোকরারা। নাম ধরে ডাকাডাকি, হৈচৈ এইসব কিছুক্ষণ ফেটে ফেটে পড়ার পর বাসটা চলতে শুরু করে। একটা খাদে পড়তেই মস্ত ঝাঁকুনি খায় সারা শরীরে। আক্কেল আলী পাশের লোকটাকে জড়িয়ে ধরে টাল সামলাবার জন্য। লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে, বাসে চড়ো নাই নাকি? ঠিকভাবে পা ছড়ায়া বসো। হাগার সময় যেমন করো। না হলে এইভাবে ডানে-বামে কেটে ফেলা কলা গাছের মতো পড়তি থাকবা। আমাদেরও ফালায়ে দেবা ওপর থেকে নিচে।

শুনে আক্কেল আলী দাঁত দিয়ে জিভ কাটে। খুব লজ্জা পেয়েছে। সে দু'পা ছড়িয়ে বসে। ঠিক হাগার সময় যেমন করে। হ্যাঁ, এখন বেশ জুত মনে হতিছে। শালার কারবার। বাসের ছাদে হাগার মতো বসা। তার একটু হাসি পায়।

পাশের লোকটি বলে, ঢাকায় কোন রাস্তায় যেতে বলেছে তোমাকে? তারপর বলে, তুমি কি একাই? সঙ্গে লোকজন নেই?

আক্কেল আলী এবার হিসাব করে বলে, সঙ্গের লোক অন্য বাসে। তারা রাস্তার কথা জানে। ঢাকা পৌঁছে তাদের কাছ থেইকে জেনে নেবো নে।

লোকটি এবার তার দিকে সন্দিগ্ধ হয়ে তাকায়। তারপর পাশের লোকটিকে কিছু বলে। সে আক্কেল আলীকে দেখে নিয়ে পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। বাস তখন বেশ জোরে চলছে। দু'পাশের গ্রাম পিছলে পিছলে পেছনে সরে যাচ্ছে। বড় সড়ক রাস্তাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সামনে, যেন জালে আটকানো একটা বড় কোরাল মাছ।

॥ খ ॥

বাসস্ট্যান্ডে তারা যেন তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। নিচে নামতেই তাদের দিকে ছুটে এসে এলোপাতাড়ি লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকলো তারা কিছুক্ষণ। দু'হাত দিয়ে যতক্ষণ পারলো নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলো আক্কেল আলী। তারপর রাস্তায় শুয়ে হাঁপাতে থাকলো। তার মাথা ঘুরছে। ঠোটের রক্ত মুখে এসে ঢুকছে। বেশ লোনা স্বাদ। আক্কেল আলী ঢোক গেলে। তার গলা শুকিয়ে এসেছে।

॥ গ ॥

ছোট ঘরটা অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। পেশাব-পায়খানার গন্ধ নাকে এসে দড়াম দড়াম ধাক্কা মারছে একটু পর পর। কে যেন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো। একজন মিনমিন স্বরে কয়েকবার বলল, পানি, পানি। লোহার শিকের বন্ধ দরজার ওদিকে পাঁয়চারি করছিল নাদুস-নুদুস যে লোকটা সে গর্জে উঠে বলল, এই বাঞ্চোতরা চোপ। চেঁচাবি না। মেরে হাড্ডি ভেঙে ফেলব। আক্কেল ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দেখলো তাদের বন্ধ ঘরের দরজার ওপাশে একটা অফিসে কালো হয়ে যাওয়া পুরনো চেয়ার-টেবিল। বেশকিছু লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কেউ টাকা বার করে দিচ্ছে। কেউ টিফিন ক্যারিয়ার দেখাচ্ছে। কারো হাতে খাবার পানির বোতল। বোতলটা দেখে তার গলার ভেতরটা আরও শুকিয়ে গেলো। হঠাৎ অফিস ঘরটায় আর সামনের বারান্দায় ফ্যাকাশে হলুদ রঙ ঢেলে দিল কেউ। সেখানকার লোকজনকে এখন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে আশপাশের কাউকে দেখে চেহারা ঠাহর করতে পারছে না। সেখানে নিকষ অন্ধকার আর নাড়ি-ভুড়ি বের করে আনা দুর্গন্ধ দাপটের সঙ্গে ছড়িয়ে আছে। আক্কেল আলী বুঝলো এখন সন্ধ্যা হয়েছে, তাই ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বলে উঠল। তাহলে পুরো দিন এই ঘরেই কাটল তার আর এখানকার লোকদের। সেই সকালে মারপিটের পর ট্রাকে উঠিয়ে এখানে এনে এক একজনের পাছায় লাথি মেরে ভেতরে ঢোকানো হয়েছে তাদের। বসবার জাগা দূরের কথা, দাঁড়াবার জাগাও নেই। গরমে ঘামছে সবাই। একটু পর সবার ভেজা কাপড়-চোপড় লেপ্টে গেল। যেন কেউ তাদের বেঁধে ফেললো দড়ি দিয়ে। তারা বন্ধ লোহার শিকের গেটটার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যার পর কয়েকজনের নাম ডাকা হল। তারা সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল তাদের দেখে মফস্বলের লোক মনে হল না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়। তাদের যারা নিতে এসেছে তাদের চেহারা শহরে ভদ্রলোকের। কাপড়-চোপড়ও কেতাদুরস্ত। আক্কেল আলী জোতদারকে খুঁজল। খবর পেয়ে তিনিও আসতে পারেন ঢাকা শহরে তাকে ছাড়িয়ে নিতে। হাজার হোক নিজ গ্রামের মানুষ। তার রেজিস্টারে আক্কেল আলীর বাপের বুড়ো আঙুলের ছাপ রয়েছে। টিপ সই। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও সে জোতদারের চেহারা দেখে না। কাছেই কোনও দোকানে বা বাসায় ক্যাসেটে গান হচ্ছে ‘ও সখিনা... আমি অ্যাহন রিকশা চালাই ঢাহার শহরে।’ গানটা আগেও শুনেছে আক্কেল আলী। এখন তার চোখ ভিজে এল। না, সখিনা-টখিনা বলে তার কেউ নেই। এমনিতেই চোখে পানি এল।

সারারাত কাটলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য ওইভাবেই ঘুমিয়ে নিল কিছুক্ষণ আক্কেল আলী। আশপাশের লোকের শরীরে ঢলে পড়তেই গালি দেয় তারা। তারা যখন ঢলে পড়ে, অন্যরা একইভাবে তাদের গালি দেয়। লোহার শিকের বন্ধ দরজার বাইরে বারান্দায় হলুদ পেশাবের মতো আলো ছড়িয়ে আছে। চোখ কটকট করে ওঠে সেই রঙ দেখে। অফিস ঘরটা বন্ধ। একজন টহল দিচ্ছে বন্দুক কাঁধে। একবার বামে, একবার ডানে।

সকালে রুটি আর পানি খাওয়ানোর পর তাদের তোলা হল ট্রাকে। আক্কেল আলী যেতে যেতে ঢাকার শহর দেখে, বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। যেন ছুটির দিন কিংবা কলেরা, মহামারি শুরু হয়েছে। বাড়িঘরের ওপরে সবুজ-লাল পতাকা উড়ছে। বড় বড় ভবনের ওপরেও তাই। আক্কেল আলী বড় বাড়িগুলো দেখিয়ে পাশের লোককে বলে, ঐগুলান কী ভাই?

লোকটা নিস্পৃহ মুখে বলে, অফিস। শুনে আক্কেল আলী চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে।

॥ ঘ ॥

আদালত থেকে তাদের জেলে নেবার হুকুম হয়। চুয়ান্ন ধারায় আসামি সব। পুলিশ জানায়। সরকারি উকিল সমর্থন করে। দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা লোকগুলো মফস্বল থেকে এসেছে। তাদের উকিল নেই। তাদের একজন চেঁচিয়ে বলে, আমাদের কোনও দোষ নেই হুজুর। আর একজন বলে, আমরা ভালা মানুষ।

পুলিশের লাঠি পড়ে কয়েকজনের পিঠে। গর্জে ওঠে স্বর, এই চোপ। এটা আদালত।

॥ ঙ ॥

জেলে খাওয়া-দাওয়া দেয়, থাকার ব্যবস্থাও আছে। তবে রাত্তির বেলায় বেশ বিপদ। আক্কেল আলীর বয়স কম। সবে এসএসসি পাস করেছে, থার্ড ডিভিশনে। শোবার সময় তাকে নিয়ে বয়স্ক কয়েদিগুলো

বেশ টানাটানি আর ধস্তাধস্তি করে। সে ভয় পেয়ে চিৎকার করলে তার মুখ চেপে ধরে একজন। লুঙ্গি খুলে নেয় কে বা কারা সে টেরও পায় না। প্রায় সারারাত এইভাবে চলে। সে দুই পাশে চাপা হাসি শুনতে পায়।

হরতাল শেষ হতেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জামিনে ছাড়া পেয়েছে এমন দেখাতে হয়। কোথা থেকে জামিনের লোক এসে যায় আদালতে তা আক্কেল আলী বুঝতে পারে না। সে লেংচিয়ে লেংচিয়ে হেঁটে কোর্টের সামনে চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেতরের লোকজনের খাবার খেতে দেখে। তার কাছে যা টাকা-পয়সা ছিল জেল হাজতে, থানা হাজতে সব লোপাট। একেবারে কপর্দকশূন্য এখন সে। একটা লোক তার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর স্বস্নেহে বলে, ক্ষিধে পেয়েছে? টাকা নেই?

শুনে আক্কেল আলী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এর আবার কী মতলব কে জানে। সে আস্তে বলে, না, না। এমনি খাড়ায়া আছি।

লোকটি তার কাঁধে হাত রেখে বলে, আমি আদালতে ছিলাম। সব দেখেছি। এসব অন্যায়-জুলুম মেনে নেওয়া যায় না। হরতাল বন্ধ করার জন্য নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে এইভাবে শাস্তি দেওয়া অন্যায়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। তারপর আদালত ভবন এবং আশপাশের দালানের ওপর পতাকা দেখিয়ে লোকটি বললো, স্বাধীনতা দিবস পালন করা হল কয়েকদিন আগে। তাই পতাকা উড়ছে। কিসের স্বাধীনতা, কাদের জন্য স্বাধীনতা? অ্যা। তারপর স্বর নিচু করে লোকটি বললো, চলো ভেতরে যাই। ভয় পেয়ো না। আমি ওদের কেউ না। নির্ভয়ে আমার সঙ্গে আসতে পারো।

হা-ভাতের মতো গোগ্রাসে নাস্তা খেলো আক্কেল আলী। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার সামনে এক কাপ চা। এতক্ষণ ধুয়ো উড়ছিল। এখন চায়ের শরীর বেশ মিইয়ে পড়েছে। লোকটা একটা সিগারেট ধরাল। দোকানের সামনে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে কামড়া-কামড়ি করছে দুটো কুকুর। লোকটি সেদিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক ওদের মতো। দুটো দল এখন ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত। একদল গণসমাবেশ করছে, অন্য দল পুলিশ দিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছে। জেলে ঢোকাচ্ছে। মাঝখানে নল-খাগড়ার প্রাণ যায়।

॥ চ ॥

খুব হাসিমুখে জোতদারের বৈঠকখানায় ঢুকলো আক্কেল আলী। তার এক হাতে বেশ লম্বা মতো একটা পুঁটলি।

জোতদার প্রথমে চমকে গিয়েছিল। তারপর সেও হাসি মুখে বললো, আরে আক্কেল আলী দেখি। এত তাড়াতাড়ি আইসা পড়লা? চাকরি হইয়া গ্যালো বুঝি?

আক্কেল আলী তার সামনে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, হইবো না? আপনাগো দোয়া।

হাতের পুঁটলিতে কি আনছো? লম্বা মতো দেহায় দেহি।

আক্কেল আলী ময়লা কাপড়ের পুঁটলি খুলে ফেলে। রাইফেলটা হাতে নিয়ে জোতদারের দিকে তাক করে বলে, টিপসই দেওয়া রেজিস্টারটা দাও দেহি মিয়া। বোঝো তো আমার হাতে কী? চাকরি। চাকরি। তারপর চিৎকার করে বলে, বার কর হারামজাদা।

আক্কেল আলী একদিন ‘ক্রসফায়ারে’ পড়বে। কবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।